তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপ-এ মনসাকথার পরিচয় সংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অনুপম অভিজ্ঞান প্রাগাধুনিক পর্বের রচনার বিশ শতকে ঘটেছে নানা অনুসৃজন। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মানুষের অস্থিরতা বাঙালির চিন্তাজগৎকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে। একের পর এক রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে পড়ে মানুষ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। বিশ শতকের মধ্যভাগে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন, নকশাল আন্দোলনের উত্থান, প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ, মিশ্র অর্থনীতির দুর্বল হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনা মানুষকে আরো জটিল ও দুর্বোধ্য করে তোলে। এই পরিসরে সাহিত্যেও চরম ক্ষয় ও শিল্পরূপের অবমূল্যায়ন চলতে থাকে। কিন্তু এই আপাত অবক্ষয়িত সাহিত্যরূপের অন্তরালে এক শ্রেণীর সচেতন বুদ্ধিজীবী মানুষ, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক সচেষ্ট হয়েছেন আমাদের ঐতিহ্য, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শনকে পুনরুদ্ধার করতে। সাহিত্যের পুনর্নির্মাণের পথে তাঁরা অন্বেষণ করেছেন প্রাচীন ঐতিহ্যের। শুধুমাত্র বর্তমান নয়, তাঁরা সমাজকে প্রসারিত করেছেন সুদূর অতীতে এবং ভবিষ্যতে। জীবন ও ঐতিহ্যের সামগ্রিকতাকে উপলব্ধি করতে গিয়ে তাঁরা বৃহত্তর সমকালকে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন। উত্তর আধুনিক সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রবণতা হল 'রূপান্তর' বা 'পুনর্নির্মাণ'। এই পথে সমালোচনার জগতেও এসেছে নির্মাণ, বিনির্মাণ, নবনির্মাণ ও পাঠক প্রতিক্রিয়ার মতো শব্দগুলি। বর্তমানে আমাদের চিরায়ত সাহিত্য বিশেষ করে চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা মঙ্গলকাব্য নিয়ে উপন্যাস, গল্প, নাটক ও কবিতা রচিত হয়ে চলেছে। চিন্তা চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে ঐ সব প্রাচীন রচনাকালগুলি নিয়ে লেখকরা অবাধ স্বাধীনতায় নির্মাণ করে চলেছেন এক একটি শিল্পরূপ। আর এই Construction, De-construction-এর পথ ধরে বাংলা সাহিত্যে যেমন বাখ্‌তিন, রলাবর্ত, মিশেলফুকো, জ্যাক দেরিদার চিন্তাজগৎ আলোড়িত হয়ে চলেছে, তেমনি মধ্যযুগের সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের দেবী মনসা, চণ্ডীর মিথকে নিয়ে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কাব্যকবিতা লেখা হয়ে চলেছে অসংখ্য; নবজাগরণের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে মানুষের কাছে ব্যক্তি প্রধান হয়ে ওঠে। নিজস্ব আরাধ্য দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করার সঙ্গে যুক্ত হয় যুক্তি-বুদ্ধি নৈতিকতা ইত্যাদি দিকগুলি। এরপর প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গোটা বিশ্ব সাহিত্যে মিথের ব্যবহার শুরু হয়। মানুষের মধ্যে অস্তিত্বের সংকট, মূল্যবোধহীনতার মুহূর্তে মিথ চরিত্রের মধ্যে বাঁচতে চায়। মিথ চরিত্রগুলি আধুনিক চরিত্রের মধ্যে

রূপান্তরিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশ শতকের জীবন সংগ্রামের চিত্র বিভিন্ন মিথ চরিত্রগুলির মধ্যে উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যে। চরিত্রের অমরত্ব লাভের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের আবহ ও মিথীয় চরিত্রকে নিয়ে আসা হচ্ছে বর্তমান আধুনিক সাহিত্যে। দেব-দেবীকে নিয়ে যে মিথীয় ভাবনাগুলি নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উঠে আসে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে। যে মিথ ভাবনাগুলি মগ্নচৈতন্য থেকে বেরিয়ে এসে নানান কল্পনা উপলব্ধি ও অনুভূতির স্তরে একটা পরিকাঠামো গড়ে রাখে, লেখক বা শিল্পী সেই ঐতিহ্য সাহিত্য বা শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তবে এই প্রকাশ মাধ্যম বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কখনো সমকালের মধ্যে এই পুরাণ প্রসঙ্গকে অস্পষ্টভাবে আভাস ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন, আবার কখনো বাইরে রেখে তার ভেতরে সমকালের সমস্যাকে প্রচ্ছন্ন করে লুকিয়ে রাখা হয়। অর্থাৎ মিথকে বহিরঙ্গে ব্যবহার করা হয়। আমাদের চিরপরিচিত মনসামঙ্গলের কাহিনীকে নিয়ে সমকালের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন বহু কবি সাহিত্যিকগণ। মনসামঙ্গলের কাহিনীকে নিয়ে একাধিক সাহিত্য রচনা করলেও সেগুলি হয়ে উঠেছে এক একটি নবনির্মাণ। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুনতর জীবন জিজ্ঞাসা উঠে এসেছে উক্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। আসলে যত দিন যাবে সাহিত্য নতুনভাবে আবিষ্কৃত হবে। তবে সাহিত্যগুলিকে আবার নতুন করে দেখা গেছে, এক একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য হয়ে উঠেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের যে বিশালতা রয়েছে তা প্রত্যেক সাহিত্য সংরূপে অনুসরণ করে লেখকগণ নিজ নিজ গুণে মৌলিক সাহিত্য গড়ে তোলেন। এতে মনসা মঙ্গলকাব্যের মাহাত্ম্য কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রত্যেকটি ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, উপন্যাস এক গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপে উঠে এসেছে। এই রচনাগুলি আধুনিক ও উত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে এবং এক নতুনতর সাহিত্যশাখার দৃষ্টান্ত হিসাবে উঠে এসেছে।

আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসাকে তুলে ধরার জন্য বাঙালীর ঐতিহ্যের দিকে হাত বাড়ানোর প্রবণতা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দেখা গেলেও এই শতকের প্রথমেই কয়েকটি গদ্য আখ্যান নাটক ও কবিতা পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান সংরূপ, যথা— নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প পভৃতির ক্ষেত্রে মনসা-কথার নবনির্মাণ আমরা দেখি। তবে বিংশ শতকের প্রথমেই শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মনসামঙ্গল কাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গদ্যের আকারে সেই চাঁদসদাগর, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীকে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আধুনিক সাহিত্যসংরূপে মনসাকথা নবনির্মাণের ক্ষেত্রে মুখবন্ধ হিসেবে উক্ত গদ্যআখ্যানটি উপযুক্ত স্থানের

অধিকারী। তাই চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ বেহুলাকে কেন্দ্র করে রচিত 'বেহুলা' (১৯০৭) নামক গদ্য আখ্যানটি আলোচনার প্রথমেই রাখলাম। তারপর নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প এই সংরূপগুলি পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং আমার আলোচনায় এই ক্রমান্বয় ধরেই চলতে থাকবে।

মধ্যযুগের অন্যতম নারী চরিত্র বেহুলার পাতিব্রত্য, সতীত্ব ও একনিষ্ঠতাকে সম্মান জানিয়ে বর্তমান আধুনিক মনোভাবাপন্ন সমাজব্যবস্থায় তাঁকে নারীশক্তির প্রতীক হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর এই 'বেহুলা' গদ্য আখ্যানের আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আধুনিক বাংলা নাটকে মনসা কথার নব নির্মাণে আমার আলোচনার বিষয় হবে নিম্নোক্ত চারটি নাটক।

১. 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭)— মন্মথ রায়

উক্ত নাটকের শেষে আমরা দেখি মনসা চরিত্রের ক্রুরভাবের বদলে স্নেহময়ী ও ক্ষমাপ্রবণ হয়ে ওঠার চিত্র। তবে এখানে চাঁদ চরিত্রের উচ্চ দার্শনিকতায় নাটকের বণিক রাজাকে নাট্যকার নিয়ে যেতে পারেন নি। বেহুলা ও লখিন্দরের পূর্বরাগের চিত্র এখানে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে।

২. 'সওদাগরের নৌকা' (১৯৭৬)— অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি দৃশ্যে নিম্নবিত্ত এক সংসারের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বিধ্বস্ত সময়ের পটভূমিকায়। চাঁদ চরিত্রের সরাসরি উপস্থিতি না থাকলেও চাঁদের আদর্শে উপস্থাপিত প্রসন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে সময় বা কালের নিয়মের ফলে মানুষের যে পরিবর্তন তা দেখানো হয়েছে।

৩. 'চাঁদ বণিকের পালা' (১৯৭৮)— শম্ভু মিত্র

উক্ত নাটকে শম্ভু মিত্র বিশ শতকের চার-পাঁচ দশকের সমাজ সমস্যা, ভাঙন, আদর্শহীনতা, শোষণ বঞ্চনা ও ব্যক্তিত্বের সংকটময় যুগে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছেন চাঁদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নাটকে মনসা হল বিশ শতকের সমস্ত প্রতিষ্ঠানিক শক্তির প্রতীক। যা বারবার বাধা প্রদান করেছে চাঁদের বাণিজ্য যাত্রায়। লখিন্দর চরিত্রের আত্মসংকট দেখা দিয়েছে নাটকে বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিতে।

৪. 'মনসাকথা' (২০০১)— শেখর দেবরায়

নাটকটিতে শেখর দেবরায় চাঁদকে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতা ভোগী মানুষে পরিণত করেছেন। অপরদিকে নাগ জনগোষ্ঠী দেবী মনসা এখানে কল্যাণময়ী, তার উগ্রতেজ

বা কপটতা নেই, নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদলে গেছে তার নিষ্ঠুরতা। এইভাবে মনসাকথার কাহিনী হয়ে উঠেছে এক নতুন পাঠকৃতি।

মনসামঙ্গলের প্রাচীন অনুষঙ্গ নিয়ে আধুনিককালে খুব বেশি কাব্য-কবিতা রচনা না হলেও বেশ কিছু কবিতায় আধুনিক কবিগণ মনসামঙ্গল, চাঁদ সদাগর ও বেহুলার অনুষঙ্গ তুলে ধরেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়, আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসা-কথার নবনির্মাণে যেগুলি কবিতার বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। সেগুলি হল—

১. 'চাঁদ সদাগর' (১৯৩৮)— কালিদাস রায়

'চাঁদসদাগর' কবিতাটি 'বৈকালী' কাব্যগ্রন্থে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়। আধুনিক বাংলা কবিতার বিশিষ্ট কবি কালিদাস রায় 'চাঁদ সদাগর' কবিতায় বিশ শতকের বিপন্ন সময়ে চাঁদ সদাগরকে পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেন। মানুষই যে দেবতা গড়ে, মানুষের কৃপার উপর যে দেবমহিমা নির্ভর করে তা এই কবিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রের পুনর্নির্মাণ করে সমকাল চেতনার প্রেক্ষাপটে চাঁদের ব্যক্তিত্বকে আহ্বান করেন।

২. 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' — জীবনানন্দ দাস

'রূপসী বাংলা' (১৯৫১) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত জীবনানন্দ দাসের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতাটি। বাংলার প্রকৃতির মধ্যে অতীতকে অন্বেষণ করতে গিয়ে জীবনানন্দ মনসামঙ্গল কাব্যের পরিমণ্ডলে উপনীত হন। 'চাঁদ সদাগর', 'বেহুলা', 'কালীদহ', 'গাঙুর', 'মধুকর ডিঙা', 'ফণিমনসা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে তিনি মিথ ও লোকপুরাণের চিত্রকল্প রচনা করেন। কবিতায় বেহুলার ঘুঙরের মধ্যে দিয়ে রূপসী বাংলায় বিপন্নতা ও অসহায়তা চিহ্নিত হয়। কবি মনসামঙ্গলের মিথকে বাংলার প্রকৃতি রূপের মধ্যে স্থাপন করে এক অপূর্ব শিল্প নির্মাণ করেছেন।

৩. 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ' —বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উক্ত কবিতাটি 'মৃত্যুত্তীর্ণ' (১৩৬২) কাব্যে সংকলিত হয়। আজকের নারীর অসহায়তা ও বিপন্নতাকে তুলে ধরেছেন কবি এই কবিতায়। উত্তরআধুনিক যুগেও নারীকে পুরুষের কাছে নানা ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। তা উঠে এসেছে এই কবিতায়।

৪. 'বেহুলা' — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'লখিন্দর' (১৩৬৩) কাব্যগ্রন্থের এই কবিতায় বিশ শতকের চার ও পাঁচের দশকের অবক্ষয়

ও অস্থিরতার একটি বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। সেই সময়ের হতাশা, সংকট ও অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই স্বপ্ন ও আশাবাদ, প্রতিবাদ করতে গিয়ে কবি রচনা করেন 'বেহুলা' কবিতাটি।

৫. 'এবং লখিন্দর' — বিষ্ণু দে

'এবং লখিন্দর' কবিতাটি 'আলেখ্য' (১৯৫২-৫৮) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। পরে বিষ্ণু দে-এর শ্রেষ্ঠ কবিতায় স্থান পায়। ২০টি চরণে রচিত পাঁচটি স্তবকে বিন্যস্ত সনেটধর্মী এই কবিতায় কবিহৃদয়ের রোমান্টিক আবেগ ও দার্শনিক মনোভাব বিকশিত হয়েছে। নদীর গতিমানতা এবং নানারূপের বৈচিত্র্য ও 'ভাঙন-গড়নের' পরিবর্তনশীল রূপ সম্পর্কে সত্য উপলব্ধির জন্য কবি মনসাপুরাণের বেহুলার উপর নির্ভর করেছেন।

৬. 'লখিন্দর', 'বেহুলা', 'সনকা', 'চাঁদ সদাগর' ও 'মনসা' — জিয়া হায়দার

কবি জিয়া হায়দারের 'কৌটোর ইচ্ছেগুলো' (১৯৬৪) কাব্যের অন্তর্গত উক্ত কবিতাগুলি। তৎকালীন যুব সম্প্রদায়ের আত্মসংকট, নারীর অধিকার চেতনা, পুরুষের দাম্ভিকতা প্রকাশ পেয়েছে কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। 'ও বেহুলা' কবিতাটি প্রত্নচেতনা অনুসারী নয়, এখানে তিনি অন্বেষণ করেন নতুন এক পৃথিবী যা মানুষের মধ্যে থেকেই পাওয়া যায়।

জিয়া হায়দারের কবিতায় লোকজ সংস্কৃতির পাশাপাশি প্রাগাধুনিক সাহিত্য এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের প্রাচীন বলে পৃথক করা যায় না। কবিতায় লখীন্দরের মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ প্রতীকীভাবে যুবশক্তির অসহায়তা চিহ্নিত হয়েছে।

৭. 'বেহুলা' — সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১৩৭৫ বঙ্গাব্দে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে 'অলিন্দ' পত্রিকার অষ্টম সংখ্যায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বেহুলা' কবিতাটির প্রকাশ। আটিটি চরণে রচিত 'বেহুলা' কবিতাটির গঠনে মঙ্গলকাব্য নেই, রয়েছে মঙ্গলকাব্যের মিথ ও লোকপুরাণ অনুসরণে সমকালের বিদ্ধস্ত সময়ের মূল্যায়ন। বিশ শতকের ছয়ের দশকে অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে যে বিপন্নতা, কবি তাকেই তুলে ধরেছেন নিজের অনুভূতিতে।

৮. 'ও বেহুলা' — অরুণ মিত্র

অরুণ মিত্রের 'ও বেহুলা' কবিতাটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৯৯ সালে। এই কবিতাটি প্রত্নচেতনা অনুসারী নয়, এখানে তিনি অন্বেষণ করেন নতুন এক পৃথিবী, যা মানুষের মধ্য থেকেই পাওয়া যায়।

৯. 'হেতালের লাঠি' — শঙ্খ ঘোষ

'হেতালের লাঠি' কবিতাটি ১৩৯০ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজারে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। 'হেতালের লাঠি' কবিতায় চাঁদের ব্যক্তিত্বকে নির্মাণ করেছেন কবি অন্যভাবে। বিশ শতকের আটের দশকের সমাজ, ইতিহাস ও জাতীয়তার চেতনাকে তিনি এখানে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন।

১০. 'মনসা মঙ্গল' — শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

'অনন্ত ভাসানে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মনসা-মঙ্গল' কবিতাটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার গ্রন্থে সংকলিতহয় ১৯৯৫ সালে) জলা-জঙ্গলময় পূর্বাঞ্চলের মানুষের চেতনায় প্রচলিত মনসাপুরাণের 'মিথ' এত গভীরভাবে প্রোথিত যে তাকে কখনোই পৃথক করা যায় না। কবি আশ্চর্য কৌশলে লোকপুরাণের আবহ তৈরী করেন বিশ শতকের আটের দশকের পটভূমিকায়।

১১. 'একালের মঙ্গলকাব্য' (২০০৩)— উত্তম দাস

কবি উত্তম দাস তাঁর 'একালের মঙ্গলকাব্য' কাব্যগ্রন্থের ৮টি কবিতায় মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তুলেছেন।

১২. 'বেহুলার ভেলা' — দীপঙ্কর মাহমুদ

রফিক উল্লাহ খান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা' (২০০৫) গ্রন্থের অন্তর্গত হয় দীপঙ্কর মাহমুদের 'বেহুলার ভেলা' কবিতাটি। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র 'বেহুলা'কে অনুসরণ করে রচনা করেন অসাধারণ ব্যঞ্জনাধর্মী এক কবিতা প্রচলিত 'বেহুলা'র অনুষঙ্গে বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বের সমাজ ও নারী চেতনার মূল্যায়ন ঘটে নতুনভাবে।

১৩. 'ডিঙা' — জয় গোস্বামী

জয়গোস্বামী তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার (২০০৮) অন্যতম এই 'ডিঙা' কবিতাটিতে মনসামঙ্গল কাব্যের বলিষ্ঠ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চাঁদ সদাগরকে বর্তমানের সমস্যাদীর্ণ পৃথিবীর কাণ্ডারি হিসেবে দেখিয়েছেন।

১৪. 'চাঁদ বণিকের ডিঙা' — কৃষ্ণা বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'একালের কবিতা সঞ্চয়ন' (২০০৯) গ্রন্থ থেকে প্রকাশিত হয় এই কবিতা এবং পরে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয়। 'চাঁদ বণিকের ডিঙা' কবিতায় প্রতীকীভাবে বর্তমানের আশা, স্বপ্ন ও সমৃদ্ধ জীবনের ঐতিহ্য ডিঙার রূপকে প্রতিফলিত হয় যা

মনসার চক্রান্তে উড়তে ভাসতে ভুলে গেছে। চারিদিকে উগ্র ভোগবাদী জীবন বোধের সময় চাঁদ বণিকের ডিঙা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে বোঝাই করে আসবে সমৃদ্ধি।

মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে লেখা বেশ কয়েকটি আধুনিক বাংলা উপন্যাস পাওয়া যায়। তা সপ্তম অধ্যায়ের অন্তর্গত আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মনসাকথার নব নির্মাণে আলোচনা করা হবে। সেগুলি মধ্যে হল—

১. 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪)— সেলিনা হোসেন

বাংলাদেশের খ্যাতিসম্পন্না লেখিকা সেলিনা হোসেন 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে মঙ্গলকাব্যের চাঁদ চরিত্রকে এক প্রতিবাদী চরিত্ররূপে দাঁড় করিয়েছেন তৎকালীন দুর্ভিক্ষ অস্থিরতাময় পরিস্থিতিতে। সেই সঙ্গে জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি আজু মৃধাকে দাঁড় করিয়েছেন মনসার প্রতিভূ রূপে। ১০টি পরিচ্ছেদে রচিত এই উপন্যাসে মঙ্গলকাব্যের অভিনব ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে।

২. 'চাঁদবেনে' (১৯৯৩)— অমিয়ভূষণ মজুমদার

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের আধুনিক বাংলা উপন্যাসে অমিয়ভূষণ মজুমদারের আবির্ভাব ৬০-এর দশকে এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা করেন। ২৯টি অধ্যায়যুক্ত বৃহত্তর এই এপিক উপন্যাসে অষ্টাদশ-নবম শতকে নৌবাণিজ্য এবং চোল-পল্লব সাম্রাজ্যের ছবি উঠে এসেছে। উপন্যাসটিতে এক নবতর দৃষ্টিভঙ্গির চিত্র ফুটে উঠেছে।

৩. 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' (১৯৯৫)— অভিজিৎ সেন

মনসামঙ্গলের লখিন্দরকে এক অন্যতর যুবা রূপে উপস্থিত করেছেন লেখক এই উপন্যাসে।

৪. 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' (১৯৯৯)— সত্যপ্রিয় ঘোষ

উক্ত উপন্যাসে দেশভাগ জনিত কারণে ছিন্নমূল হয়ে পড়া মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে কঠিনতম সময় অতিক্রম করতে চাওয়া এক মানুষের এগিয়ে চলার কাহিনি। দশটি পরিচ্ছেদে রচিত 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' উপন্যাসটির সর্বত্র মনসামঙ্গলের প্রচলিত মিথকে মূল্যায়িত করার প্রচেষ্ঠা রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে অন্তর্গত আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা-কথার নব নির্মাণে আমরা যে

ছোট গল্পগুলো পেয়েছি সেগুলো হল—

১. 'বেহুলা' — মহাশ্বেতা দেবী

'প্রমা' (১৯৭৮) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এই গল্পটি। পরে 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে আড়াই ঘন্টার পথে হাঁটা দূরত্বে ২৪ পরগনার ইরফানপুর ব্লকের বেহুলা গ্রামের অত্যাচারিত সাধারণ মানুষদের বেঁচে ওঠার কাহিনীকে লেখিকা তুলে ধরেছেন উক্ত ছোটগল্পে। 'কালাজ সাপ' অর্থাৎ শিয়রচাঁদা বা শিকড়চাঁদা সাপের কামড় থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য গ্রামের জোতদার সুবিধাভোগী, স্বার্থপর নিষ্ঠুর মানুষ হোদো নস্করের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সাংকেতিকভাবে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নামও বেহুলা রাখা হয়েছে। মনসামঙ্গলের সতী, শুদ্ধ রমণী বেহুলার মতো এই নদীও সব পাপ অমঙ্গল ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়ে বেহুলা গ্রামকে শুদ্ধ করে তোলে। এইভাবে লেখিকা প্রচলিত মিথ ও মনসাপুরাণের অন্ধকার প্রাচীনতম ও রহস্যময়তার দিকটি কাটিয়ে উঠে তৈরী করেন এক নতুন সাহিত্য। পুরাণের মিথকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিরোধের ভাষা জুগিয়েছেন লেখিকা।

২. 'বেহুলা' — বিমল কর।

১৯৯২ বঙ্গাব্দে শারদীয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত এই গল্পটি। 'বেহুলা' নামকরণের অনুষঙ্গে গল্পটির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের 'মিথ' ছায়া ফেলেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও তার স্ত্রী ইন্দুমতীর সঙ্গে কাজের মেয়ে বেহুলাকে কেন্দ্র করে গল্পটি নির্মিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের বেহুলার মত এই বেহুলার সেবাপরায়ণতা, সৎভাব, একনিষ্ঠতা দেখা যায়। যার ফলে বৃদ্ধের ছেলেমেয়েদের থেকেও আপন হয়ে উঠেছে সে। মনসার কথা না থাকলেও মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলার মড়া নিয়ে স্বর্গে যাওয়ার কথা রয়েছে। পুরাণের বেহুলা সেভাবে চাঁদ সদাগর ও লখিন্দরের মুক্তি কামনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তেমনি এই গল্পের বেহুলাও ঠাকুরদা ও তার স্ত্রী ইন্দুমতীর সেবাযত্ন করে তাদের সারিয়ে তোলে।

৩. 'সতত বেহুলা' — সাধন চট্টোপাধ্যায়।

'পরিকথা' (ডিসেম্বর, ২০০৫) পত্রিকার প্রথম প্রকাশিত হয় এই গল্প। ও 'গল্প ৫০' (২০০৯) গ্রন্থে সংকলিত। একুশ শতকের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে গল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সংকট এবং মনোবিশ্লেষণের নানা অভিব্যক্তি 'সতত বেহুলা' গল্পটিতে। পঁচাত্তর বছরের

শান্তিনাথের জীবনে না পাওয়ার বাসনা নিয়ে রচিত গল্পটি মনসামঙ্গলের লোকপুরাণ আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত হয়ে কাহিনীকে প্রতীকী করে তুলেছে।

উপরিউক্ত বিষয়বস্তুর ভিত্তিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনাগুলি অগ্রসর হবে এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপে মনসাকথার নবনির্মাণ ঘটেছে কতটা তা আলোচিত হবে।

*****